ব্যক্তিসংস্কৃতি বদলে নারীর প্রজনন ও গার্হস্থ্য কর্মভার লাঘব করা সম্ভব

এটা ঠিক যে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তঃব্যক্তিক ক্ষেত্রের বৃহত্তর প্রেক্ষিতেও আমাদের নারীরা আজ কমবেশি দৃশ্যমান। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, উচ্চ পারিশ্রমিকে চাকুরি, জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে সক্রিয়তা এবং বিয়ে সন্তানধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করবার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের নারীদের মধ্যে এখন আর বিরল নয়। তবে সংখ্যাগত বিবেচনায় এ চিত্র গোটা নারীসমাজের খুবই ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের নারীদের বৃহত্তম অংশ আজো এমনকি পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়েও ক্ষমতায়নের সুফল ভোগ করতে পারে নি। চলাফেরার স্বাধীনতা বা ইচ্ছেমতো সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে পারা, নিজের স্বল্প আয়ের ওপরে নিয়ন্ত্রণ কী সম্পদের মালিকানা ভোগ, রাজনীতিতে যুক্ত হবার স্বাধীনতা অথবা স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়তা, পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিতে পারা এবং যেকোনো নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা আজো সিংহভাগ নারীর আয়ত্তে নেই। সেই বিবেচনায় বলা যায়, প্রচলিত সংজ্ঞায় বাংলাদেশের নারীসমাজ এখনো সামগ্রিকভাবে ক্ষমতায়িত নয়। আমাদের সিংহভাগ নারীকে পরিবারের পুরুষকর্তার দেয়া রূপরেখা অনুযায়ী তারই ইশারা-ইঙ্গিতে চলতে হয়। এতে নারী তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ভালোলাগা-মন্দলাগা ও প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রতি সুবিচার করতে পারে না; সর্বোপরি, তার অসীম সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করে নিজের কিংবা সমাজ-রাষ্ট্রের জন্য দৃশ্যমান ভূমিকা রাখতে পারে না।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সুস্বাস্থ্যের জন্য এ অবস্থার বদল হওয়া আবশ্যক। গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে চাইলে অক্ষমতায়িত সিংহভাগ নারীকে ক্ষমতায়নের আওতায় আনতে হবে। এ ব্যাপারে প্রায় কারোরই কোনো ভিন্নমত নেই। সেটা করতে হলে প্রধানত নারীর প্রজনন ও গার্হস্থ্য কর্মভার লাঘব করতে হবে। আমরা জানি, ধনি-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিবাহিত-অবিবাহিত, চাকুরিজীবী-বেকার নির্বিশেষে সকল নারীরই কমবেশি এই ভার টানতে হয়। লক্ষণীয় যে, মজুরি ও স্বীকৃতিহীন কাজের এই ভার যার ওপরে যত বেশি, ক্ষমতায়ন থেকে সে তত বেশি দূরে অবস্থান করে। তার মানে হলো, নারীসমাজকে যদি আমরা গুণগতমানে উৎকৃষ্ট জীবনের দিকে নিয়ে যেতে চাই, যদি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ চাই, তাহলে নারীর কাঁধ থেকে এই ভার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা জরুরি।

এজন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে নারীকে সন্তান ধারণে বাধ্য না-করা, সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়া, গার্হস্থ্য কাজকে কেবলই নারীর কাজ হিসেবে না-ভাবা এবং যন্ত্রবৎ আচরণ না-করে নারীকে পরিবারের সদস্য হিসেবে আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে ভাবা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি এরকম সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হই, তাহলে ব্যক্তিনারীর জীবনমানে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের বাইরে নারীকে তার প্রাপ্য সম্মান দিলে হাজার বছরের অনভ্যস্ততার কারণে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অবদান রাখার ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে যে মনোজাগতিক বাধা রয়েছে, তা-ও অপসারিত হবে। বেঁচে যাওয়া সময়ে বিনোদন, জ্ঞানচর্চা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর যুক্ত হবার অবকাশ তৈরি হবে ও উৎসাহ বোধ করবে। এতে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য রক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিতেও সুপ্রভাব পড়বে। সন্তান সংখ্যার বাড়াবাড়ি কমলে জনসংখ্যার ভারে পীড়িত রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য বিভিন্ন সেবা সরবরাহে অর্থ সাশ্রয় হবে ও জনসংখ্যা সমস্যা না-হয়ে জনসম্পদে পরিণত হবে।

এটা শুধু আইন করে বাস্তবায়ন করবার বিষয় নয়। এটা একটা অগ্রসর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চর্চা করবার বিষয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এর চর্চা শুরু হলে রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই আমরা নারী-পুরুষ সম্পর্কের বর্তমান ধরনটাকে আমূল পালটে দিতে পারব, ভালোবাসাপূর্ণ যে ধরনের আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক আমরা সবাই মনেপ্রাণে প্রত্যাশা করি।